জীবনের প্রান রায়াসনিক উপাদান

(প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে -২)

অভিজিৎ রায়

পূর্ব্বর্তী পর্বের পর হতে...

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ বা জীবন নিয়ে কেবল প্রাণিবিজ্ঞানী কিংবা জীববিজ্ঞানীরাই যে সবসময় ভেবেছেন তা কিন্তু নয়। প্রাণের গোলকধাঁধার দুর্জ্ঞেয় রহস্য আর মায়াবী মুখচ্ছবি যুগে যুগে পুরোমাত্রায় আলোড়িত করেছে অন্য শাখার বিজ্ঞানীদেরও। আজ হতে প্রায় বাষট্টি বছর আগে নোবেল বিজয়ী অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ অর্ভিন শ্রোডিংগার একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে উচ্চারণ করেছিলেন দুই শব্দের শতাব্দী-প্রাচীন সেই দার্শিনিক পংক্তিমালা - 'জীবন কি' (What is life)? যে সমস্যাটিকে এতদিন ধরে ভাবা হত কেবলই জীববিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সমস্যা হিসেবে, অধ্যাপক শ্রোডিংগার সে সমস্যাটিকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা দিলেন পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়ন বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম কানুন দিয়ে, প্রথমবারের মত। সেই থেকে শুরু। সে সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণগুলো নিয়ে ১৯৪৪ সালে লিখিত What is life? নামের সেই যুগান্তকারী বইটিতে শ্রোডিংগার জীবনকে দেখতে চেয়েছেন এক বিদ্ঘুটে ধরনের 'অনাবর্তী কেলাস' (aperiodic crystal) হিসেবে যার গাঠনিক আকারের বৈচিত্রময় পুনরুৎপত্তি এবং বিবর্ধন ঘটে। তবে জীবন যে কেবল 'অনাবর্তী কেলাস' নয়, বরং এর অভিব্যক্তি যে আরো গভীর - সেটা শ্রোডিংগার নিজেই বুঝেছিলেন আর বলেছিলেন, 'জীবনের জটিলতাকে কেলাসের সাথে তুলনা করা হবে যেন এক নিরস ওয়াল পেপারের সাথে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিখচিত এক নক্সিকাঁথার তুলনা'!

জীবনকে বুঝবার ক্ষেত্রে শ্রোডিংগারের বইটির অবদান কিন্তু সত্যই ব্যাপক। বইটি লেখার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ডিএনএ'র যুগল সর্পিলের রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী

ওয়াটসন আপ্লুত হলেন শ্রোডিংগার বন্দনায়, খুব স্পষ্ট করেই কিন্তু বললেন, সতেরো বছর বয়সে যদি এই বইটি পড়ার সুযোগ না হত, তবে হয়ত তাঁর জেনেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহই কখনও সৃষ্টি হত না! বুঝুন কী কান্ড! ঠিক একই ভাবে ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'What Mad Pursuit' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে শ্রোডিংগারের এই মহামূল্যবান বইটি একসময় তাকে উৎসাহিত করেছিল জেনেটিক্সের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবতে।

চিত্র ২.১ : অর্ভিন শ্রোডিংগার (১৮৮৭-১৯৬১)

তবে বইটির অবদান কেবল ক্রিক-ওয়াটসনকে ডিএনএর রহস্য সমাধানে আগ্রহী করে নোবেল বিজয়ী হতে সহায়তা করা নয়, বরং এর আবেদন অনেক গভীরে। এ বইটিই প্রথমবারের মতো আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে যে, জীবনকে জানতে হলে, মূলতঃ জীবনের উৎস সন্ধান করতে হলে শুধু জীববিজ্ঞানী হয়ে বসে থাকলে চলবে না, একই সাথে পরিচিত হতে হবে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার বর্ণাঢ্য জগতের সাথে। সেটিই খুব পরিস্কার করেন আরেক নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর Facing Up : Science and Its Cultural Adversaries গ্রন্থে এভাবে :

> No biologist today will be content with an axiom about biological behaviors that could not be imagined to have a more fundamental level. That more fundamental level would have to be the level of Physics and chemistry, and the contingency that the earth is billions of years old.

ব্যাপারটা খুবই পরিস্কার। প্রাণের উৎসমুখে মানে গোড়ায় কিন্তু ডায়নোসার, বাঘ, ভাল্লুকের মত কোন অতিকায় প্রাণী নেই, নেই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর জীবজগতের নানাপদের বৈচিত্র। প্রাণের উৎপত্তির মূলে যা আছে তা খুবই কাঠ খোট্টা-নিষ্প্রাণ কতকগুলো সাদা মাঠা রাসায়নিক পদার্থ! তাই জীবনকে বুঝতে হলে এই কাঠখোট্টা পদার্থগুলো সম্বন্ধে জানা চাই,

ভাল করে বোঝা চাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, জীবনের গঠনকে সাধারণভাবে যত জটিল বলে মনে করা হয়, ততটা জটিল কিন্তু মোটেই নয়, বরং জীবনের প্রাথমিক ভিত্তিমূল অবিশ্বাস্য রকমের সরল। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, জীবনের ভিত্তি তৈরী হয়েছে মাত্র চারটি সাধারণ মৌলিক পদার্থ দিয়ে : কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N); সংক্ষেপে বলে CHON। সালফার আর ফসফরাসকে গোনায় ধরলে মূল উপাদান দাঁড়ায় ছ'টি তে - CHON(SP)। এই উপাদানগুলোকে মাথায় রেখেই মূলতঃ জীবনকে সংগায়িত করার কাজটি আমাদের আরম্ভ করতে হবে, কারণ জন্মের পর থেকেই যে বৈচিত্রময় জীবজগতের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি, তার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগই কিন্তু তৈরী হয়েছে এই 'খন' (CHON) দিয়ে।

Atom	Hydrogen	Oxygen	Nitrogen	Carbon	Phosphorus	Sulfur
Valence	1	2	3	4	5	2, 6
Model	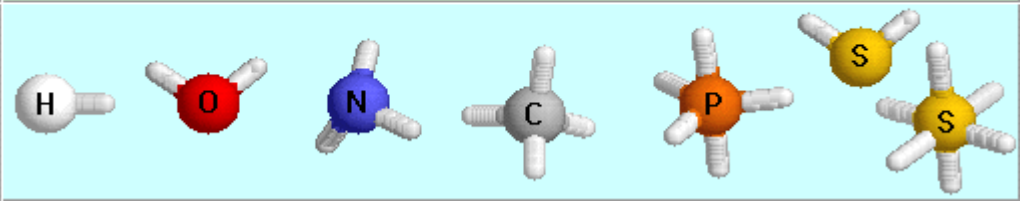					

চিত্র ২.২ : জীবন গঠনের পেছনে মূল উপাদান - CHON(SP)

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে সব ছেড়ে ছুড়ে এই '*খন*' কেন? কেন লোহা, তামা, সোনা, টাইটেনিয়াম কিংবা ক্রিপটন নয়, কিংবা নয় আর কোন বিজাতীয় সংকর? উত্তরটা কিন্তু সোজা। জীবনের গঠন *খন* দিয়ে শুরু হয়েছে কারণ, প্রকৃতিতে এই উপাদানগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য আর প্রাচুর্য রয়েছে - সেই উৎপত্তির প্রারম্ভ থেকেই। যে পাঁচটি মৌল কণিকা এ বিশ্ব-চরাচরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তার চারটিই হচ্ছে *খন*। অপর মৌলটি হল হিলিয়াম (He)। কিন্তু হিলিয়াম এতোটাই ঘরকুনো, মানে রাসায়নিক ভাবে নিষ্ক্রিয় যে *খন*-এর সদস্যরা হিলিয়ামের সাথে কোন বন্ধুত্বই গড়ে তুলতে পারে নি। কাজেই হিলিয়াম বেচারার এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, ছোট বাচ্চাদের গ্যাস বেলুনের মধ্যে সেঁদিয়ে থাকা ছাড়া জীবনগঠনে তার কোন ভুমিকা নেই। প্রকৃতিতে খন্ বাবাজীর প্রচুর পরিমানে থাকাটাই প্রাণ সৃষ্টির পেছনে একমাত্র কারণ নয়, বরং পাশাপাশি এও দেখা গেছে এরা আবার একে অপরের সাথে মিলে নানা ধরোনের যৌগ উৎপন্ন করতে পারছে- যেমন মিথেন (CH_4), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3) ইত্যাদি। এ যৌগগুলো যেহেতু আবার পানিতে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়, এগুলো জীবন গঠনের পেছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পানির ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হেলাফেলা করবার নয়; কারণ যে কোন জীবদেহে - সে আমাদের মানব দেহই হোক আর কুমড়া কিংবা লেটুস পাতার ডগাই হোক - বিরাট একটা অংশ জুড়ে রয়েছে কেবল পানি আর পানি! জীবদেহের এই জলীয় অংশটা

আসলে সুদূর অতীতে প্রাণের স্পন্দন যে একটা জলজ পরিবেশে ঘটেছে আর বিবর্তিত হয়েছে, তার এক অবশ্যাম্ভাবী সাক্ষী। আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মতরে এই 'জলীয় তথ্য' কোষের মধ্যে বহন করে চলেছি। ফলে দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া থেকে ছত্রাক, ছত্রাক থেকে কোলা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ থেকে তিমি মাছ, কিংবা তিমি মাছ থেকে মানুষ - পৃথিবীতে প্রাণের যে বিস্তৃত পরিসর আমাদের হতবিহবল করে মূক করে দেয়, সেটি কিন্তু এক্কেবারেই সরল একটা পর্যায়ে নেমে আসে প্রাণের উৎসমুখে এসে।

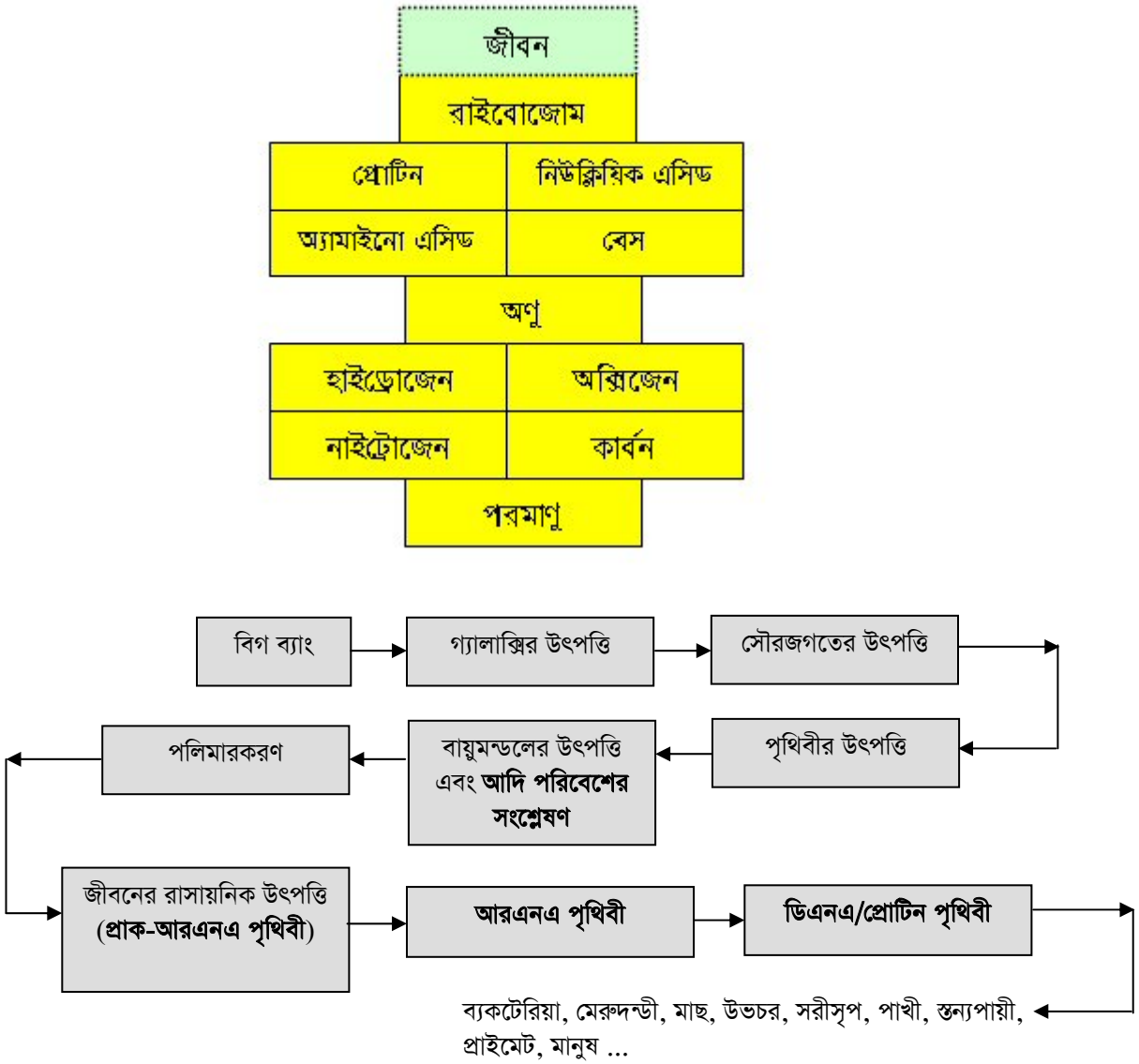

চিত্র ২.৩ : জীবনের একটি অতি সরল রেখাচিত্র

সেই উৎসমুখে অর্থাৎ প্রাণের রাসায়নিক স্তরে নেমে আসলে দেখা যায়, সমস্ত প্রাণ - তা তিমি মাছেরই হোক, কিংবা মানুষেরই হোক, শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ওই CHON(SP) দিয়ে।

কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায় এই *খন্ই* হল 'জীবন গঠনের' প্রাথমিক ধাপ। এই ধাপের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে পরবর্তী ধাপ গুলো - অ্যামিনো এসিড, চিনি, ডিএনএ, আরএনএ কিংবা অন্যান্য মনোমার। ওগুলোর উপর ভর করেই আবার পরবর্তীতে তৈরী হয়েছে বিভিন্ন পলিমারের অনু যেমন - প্রোটিন, শর্করা কিংবা নিউক্লিয়িক এসিড- এগুলো সবগুলোই কিন্তু জীবন গঠনের নিয়ামক- জীবন সৌধের এক একটি সিঁড়ি; তারপরও একথাও সত্যি যে, এগুলো কোনটাই নিজেরা আলাদা ভাবে 'জীবন' নয়। ব্যাপারটিকে অনেকটা আমাদের মস্তিকের 'চিন্তাশক্তি' অথবা সচেতনার সাথে তুলনা করা যায়। আলাদা আলাদা ভাবে মাথার মধ্যকার লক্ষ লক্ষ নিউরনগুলোর কোনটিই কিন্তু এককভাবে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু এই 'নির্বোধ' নিউরনগুলোই সম্মিলিতভাবে এক ধরণের অভিব্যক্তির জন্ম দেয় যাকে আমরা বলি *কনশাসনেস* বা চেতনা! প্রাণও কিন্তু অনেকটা এরকমই - নিষ্প্রাণদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এক ধরণের সম্মিলিত সজীব অভিব্যক্তি।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে, জীবন সম্পর্কে যে কোন মৌলিক প্রশ্ন তুলবার আগে জীবনের সনাক্তকরণটি জরুরী। কিভাবে জীবিত ও জড় - এ দুই জাতের পদার্থকে একটা মাপকাঠি দিয়ে আলাদা করা যায়? **বহিরাঙ্গের গঠন** ও **আকৃতি** অবশ্যই একটা মাপকাঠি। তবে বহির্বৈশিষ্টের পাশাপাশি আরও দুটি আচরণ, যেমন অবিকল নকলরূপী ভবিষ্যত তৈরি করা এবং 'উদ্দেশ্যপূর্ণ' অবস্থানকে জীবিতদের গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সংজ্ঞায়ও সমস্যা আছে। সমস্যা হয় ভাইরাসকে নিয়ে, আবার সমস্যা হয় কেলাসকে নিয়ে।

জড় পদার্থের ক্ষেত্রে কেলাস ক্ষুদ্র মাপের কেলাস কণাকে আশ্রয় করে 'জন্ম' নেয়। আবার অনাদরে ফেলে রাখলে কেলাসের জ্যামিতিক অবয়ব বিনষ্ট হয়, যা এক প্রকার 'মৃত্যু'। কেলাসের বৃদ্ধি তো আছেই। কেলাসের কণা তরল দ্রবণের মধ্যে অথবা গলিত পদার্থের মধ্যে তার স্বজাতিকে নির্বাচন করে 'অবিকল নকলরূপী ভবিষ্যতের সৃষ্টি করতে' পারে- ফলে জন্ম নেয় দ্বিতীয় প্রজন্মের কেলাস। এত মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলেই জানি কেলাস জীবিত পদার্থ নয়, কারণ কেলাসের খাদ্য-শোষনের ব্যবস্থা নেই, বিপাক প্রক্রিয়া নেই, নেই আর কোন জটিল শারীরিক প্রক্রিয়া।

আবার ভাইরাসের কথা চিন্তা করা যাক। ভাইরাস জীবিত ও জড়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। ভাইরাসকে কেউ জড় বলতে পারেন, আবার জীবিত বলতেও বাঁধা নেই। এমনিতে ভাইরাস 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। ভাইরাসে থাকে প্রোটিনবাহী নিউক্লিয়িক এসিড। এই নিউক্লিয়িক এসিডই ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের আধার।

অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন আদিমকাল থেকেই জৈববিবর্তনে ভাইরাস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে ভাইরাসকে বোঝা চাই। নিউক্লিয়িক এসিড বা প্রোটিন এরা কেউ জীবিত নয়, এরা জীবনের উপাদান। নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে যে ভাইরাসকেন্দ্র গড়ে ওঠে তাও জীবিত নয়, যতক্ষণ না তারা নিজের পুনরুৎপাদন করছে। একমাত্র যখন ভাইরাস দখলকৃত কোষকে আশ্রয় করে বংশবিস্তার করতে পারে তখনই কেবল ভাইরাসকে 'জীবিত' বলা যেতে পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কতকগুলো প্রোটিনের সমন্বয়ই প্রাণ নয়, প্রাণ হচ্ছে 'কাজের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি'। এই সক্রিয় অভিব্যক্তিই আসলে জীবনের ভিত্তি। প্রোটিনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে জীবিতদের দেহে। *জীবিত বস্তু আসলে ঠিক ততক্ষণ জীবিত যতক্ষণ এর ভিতরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে।* জে.বি.এস হলডেনের ভাষায়,

> "Any self-perpetuating pattern of chemical reaction, might be called alive."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শরীরের কতটা জীবিত আর কতটা নয়? বৃহৎ প্রাণিদেরদের ক্ষেত্রে হয়ত এই পরিমাপের একটা অর্থ আছে কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে নেই। জীবিত বস্তু যত সরল, তত বিস্তৃত এর জীবন। এককোষী অ্যামিবাকে ছিন্ন করে দু'ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিটি ভাগের ক্ষমতা আছে নতুন জীবন 'তৈরি' করার, যদি প্রতিটি ভাগেই নিউক্লিয়াসের অংশ থাকে। এ থেকে নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সাইটোপ্লাজমকে বাদ দিয়ে শুধু নিউক্লিয়াস কি পারবে নতুন অ্যামিবার জন্ম দিতে? না, পারবে না। *অতএব নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম- এককথায় একটি পরিপূর্ণ জীবনকোষই পারে নতুন জীবনের জন্ম দিতে। কাজেই কোষই হচ্ছে জীবনের ক্ষুদ্রতম আধার।* এখন কোষকে জীবনের ক্ষুদ্রতম আধার ঘোষণা করায় ভাইরাসবাদীরা হয়ত আপত্তি করবেন। তারা বলতে পারেন, শুধু 'নিউক্লিয়িক এসিড' নিয়ে 'বেঁচে থাকা' ভাইরাসরা তো জীবিত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ভাইরাসের 'বেঁচে থাকা' সম্ভব হয় যখন সে হাতের কাছে ভর করার মত ভিন্ন 'জীবিত' কোষের সাইটোপ্লাজম পায়।

আসলে জীবনের সংজ্ঞার চেয়ে জীবিত বস্তুর সংজ্ঞা অনেক বেশী সহজলভ্য। ১৮৫৮ সালের কোষ মতবাদ থেকে জীবিত বস্তুর সংজ্ঞায় পৌঁছুতে পেরেছি আমরা। উইলিয়াম কিটোনের Biological science-এর সংজ্ঞাটি হল ঃ

Living things are chemical organizations compared of cells and capable of reproducing themselves ('জীবিত বস্তু কোষ নির্মিত রাসায়নিক পদার্থ যা পুনরুৎপত্তির ক্ষমতা রাখে'।) এই সংজ্ঞানুসারে জীবিত বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলঃ

১) এটি হতে হবে কোষ নির্মিত
২) তার পুনরুৎপত্তির ক্ষমতা থাকবে (অর্থাৎ কোষ থেকে কোষ উৎপন্ন হবে)

কিন্তু ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মার্টিনাস বেইজারনিক ১৮৮৯ সালে এবং ১৮৯২ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী দমিত্রি ইভানোবস্কি ভাইরাস আবিস্কার করলে এই কোষ মতবাদের প্রথম প্রতিপাদ্য ভেঙ্গে পড়ে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডবলিউ. এম. স্ট্যান্‌লি ১৯৩৫ সালে দেখিয়েছিলেন যে, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া এক নয়। তিনি তামাক-মোজাইক ভাইরাসের কেলাস তৈরী করলেন। বোঝার কোন উপায়ই নাই যে, কেলাসগুলো জীবিত বস্তু। অকোষীয় বস্তুটিতে কোন বিপাক নেই। কিন্তু তামাক গাছে প্রবেশ করিয়ে দিলে দেখা গেল তারা বিভাজিত হয়ে রোগের উৎপত্তি ঘটাচ্ছে। ভাইরাসের জীবনকে মেনে নিলে জীবনের সংজ্ঞায়ন করতে হয় অনেক ব্যাপক পরিসরে। অকোষীয় (acellular) এবং কোষীয় (cellular) - এ দু ধরনের জীবন বা জীবকে মেনে নিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে জীবনের নবতর সংজ্ঞায়ন জরুরী হয়ে পড়ে। বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ ও জীববিদ জে ডি বার্ণাল (১৯৫১) জীবনের সংজ্ঞায়ন করেন এভাবে :

> *'একটি নির্দিষ্ট আয়তন বা স্থানের মধ্যে স্বচালিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম জীবন'*। তিনি আরো বললেন, *'জীবন হচ্ছ এক অতি জটিল ভৌত রাসায়নিকতন্ত্র যা একগাদা সুসংহত বা একীভূত ও স্বনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক ও ভৌত বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিপার্শ্বের বস্তু ও শক্তিকে স্বীয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করে।'*

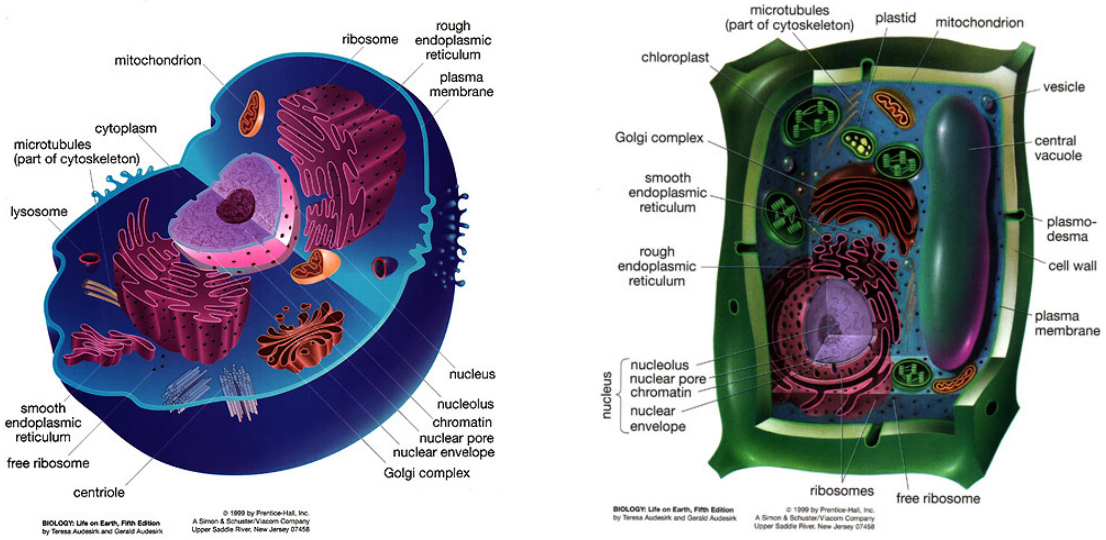

চিত্র ২.৪ : প্রাণী এবং উদ্ভিদ কোষ

মূলতঃ পঞ্চাশের দশকের পর হতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য বলে মানা হচ্ছেঃ

ক) নিজের প্রতিলিপি তৈরী করা
খ) মিউটেশন ঘটনোর ক্ষমতা
গ) ডারউইনীয় বিবর্তন।

কোষীয় ও অকোষীয় নির্বিশেষে জীবের একটি রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে উক্ত তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জীবনের মুল উপাদানটি নিউক্লিয়িক এসিড (মুলতঃ ডিএনএ / আরএনএ)। এটি জড় বস্তু হলেও নিজের অনুলিপি তৈরী করে ও বেস অনুক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিরল মিউটেশন ঘটায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডিএনএ জড় বস্তু হলেও তাতে জীবনের দুটি মৌলিক লক্ষণ প্রকাশিত। কিন্তু তারপরও কোষের সাহায্য ছাড়া ডিএনএ একা দুটি কাজ করতে পারে না। এনজাইম হচ্ছে প্রোটিন। সুতরাং ডিএনএ এবং প্রোটিনের উৎপত্তি জীবনের উৎপত্তির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে - এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি জীবনের প্রারম্ভ ঘটে জীবন থেকেই, জীবনই তৈরি করে পরবর্তী প্রজন্মকে; কিন্তু ধারণা করা হয় যে ‘প্রথম জীবন’ জন্ম নিয়েছিল অজৈব পদার্থ থেকে। জীবন যদি অজৈব পদার্থ থেকে জাত হয় তাহলে কোন অংশে এই উল্লম্ফন ঘটল তা জানা চাই। কী সেই মৌলিক কারণ এবং পরিবেশ যা নিষ্প্রাণকে একদিন প্রাণে পরিণত করল? পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।

প্রথম প্রকাশ : ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩
পুনর্লিখন : ৫ মার্চ, ২০০৬

{দ্বিতীয় অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...